প্রথম অধ্যায়

ছড়ার উদ্ভব
ও
বিকাশ

ছড়ার উদ্ভব ও বিকাশ

ছড়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ

ছট্ থেকে ছড়া শব্দের উৎপত্তি। সাধারণত এইরকমই অনুমান করা হয়ে থাকে; যার অর্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। ছড়ার ভেতর ভাব বা চিত্ররাশি অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে, এরকম ধারণা থেকেই নামকরণ সম্ভবত হয়েছে। ছড়ার মধ্যে নানাভাব ও চিত্রের সমাবেশ হয় একথা সত্যি; কিন্তু সেই ছড়ানো ছিটানো ভাব বা ছবিকে এক অন্তরঙ্গ বন্ধনে বেঁধে ফেলাই ছড়ার কাজ। আপাতদৃষ্টিতে সেই সংরক্ষণ সূত্র হয়ত ধরা পড়ে না, কিন্তু সার্বিক সমীক্ষায় এক অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়।

ছড়া বলতে সাধারণত আমরা বুঝি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কবিতা বিশেষ। লোকায়ত মানসের এক আদিমতম বাক্শিল্প তথা লোক সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ অধ্যায় ছড়া।

রাজশেখর বসুর মতে - ছড়া (ছটা) ছিটা (গোবর দেওয়া) গুচ্ছ, গাছা। মালা, গ্রাম্য কবিতা, কাটা-ছড়া,আবৃত্তি বা রচনা করা, ছড়াকার, (কবির দলে যে মুখে মুখে ছড়া কাটে)। [১]

সুবল চন্দ্র মিত্র ছড়ার অর্থ নির্দেশ করেছেন এইভাবে - গুচ্ছ, স্তবক, থোলো, মালা, বরকন্যার বস্ত্রে গ্রন্থি, গোবর জলের ছিটা, বিক্ষেপ, কবিতার শ্লোক, যাহার চামড়া বা খোলা ছড়ান হয়েছে এমন, আঁচড়ানো, ত্বক উন্মোচন করা, গোলা ছড়ানো।[২]

নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেন - ছড়া হল বঙ্গীয় লোক সাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশ ভঙ্গীর একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গী; সেটিকে নারী ও পুরুষ আপন আপন প্রয়োজনে গ্রহণ করেছে - তা কেবল নারী বা কেবল পুরুষের নয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ায় রচনাগত ভঙ্গীটি প্রায় এক এবং অবিকৃতই আছে। তিনি আরও বলেন - আসলে লোক সাহিত্যের কোন বিভাগই অসঙ্গতিতে পূর্ণ নয়, লোক মানস কয়েকটি প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীককে খুব গুরুত্ব দেয়। ছড়ার মধ্যেও সেই প্রতীক প্রবণতা ধরা পড়ে।' [৩]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন - "কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা, সংস্কৃত ছটা প্রাকৃত ছড়া। [৪]

যোগেশচন্দ্র রায় ও আশরাফ সিদ্দিকি ছড়ার অসঙ্গতি ও পারম্পর্যহীনতায় কারণ হিসাবে ক্রমবিকাশ ও কাল চেতনাকে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মানুষের মধ্যে যত চিন্তা ও যুক্তির স্পষ্টতা এসেছে ততই ছড়ার অসঙ্গাতি উধাও হয়েছে।

ছড়া শব্দের এইরকম একাধিক অর্থ ধরা পড়লেও অর্থগুলির নির্যাস যে কথাটি বলে তা হল ছড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সচেতন অথবা অসচেতন ভাবনার গ্রন্থিবদ্ধ রূপ যার মধ্যে সমসময় তার সামাজিক অবস্থানটিকে সমষ্টি ভাবনার মধ্য দিয়ে অতি সংহত রূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে।

ছড়ার বৈশিষ্ট্য ঃ

ছড়ার বিশেষত্বের দিকগুলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম যথার্থভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নামে ছেলেভুলানো ছড়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি বয়স্ক মানুষেরই সৃষ্টি, যা শিশু মনস্তত্ত্বকে আয়ত্ব করে লেখা হয়। শিশুমনের রূপকল্পিত চিত্রজগৎ মেলে ধরা, যাতে শিশুর জগতের সঙ্গে বাহ্যিক জগতের

একটা মেলবন্ধন সূচিত হয়, অথচ কথার টানে খাপছাড়া বা অসংগতি লক্ষ্য করা গেলেও শিশু মনস্বত্বের পক্ষে ভারবাহী হয় না। বরং শিশু মনের অন্তরের গভীরের নানা রূপময় চিত্রজগৎ যা বুড়োরাও উপলব্ধি করতে পারেন।

ডঃ ওয়াকিল আহমেদ ছড়ার যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন তা হল ঃ-

১। ছড়া মূলত আবেগ অনুভূতি জাত, বুদ্ধিপ্রসূত নয়।
২। ছড়া চর্চায় সব বয়সের নরনারী অংশগ্রহণ করে।
৩। ছড়ায় বিষয়-বৈচিত্র্য আছে - লঘু-গুরু সব ধরনের বিষয় এবং হাস্য-করুণ-ব্যঙ্গ-শান্ত নানা ধরনের রস নিয়ে ছড়া তৈরী হয়।
৪। ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে যা 'ছড়ার ছন্দ' বা স্বরবৃত্ত ছন্দ নামে পরিচিত।
৫। ছড়া আবৃত্তি সুখকর।
৬। ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনি স্পন্দিত বলে স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়।
৭। ছড়ার ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গি সহজ সরল প্রত্যক্ষ ; কচিৎ হেঁয়ালির ভাষা ব্যবহৃত হয়।
৮। ছড়া চিত্ত বিনোদনের নির্মল মাধ্যম, কোন কোন ছড়ায় গ্রাম্যতা থাকলেও অশ্লীলতা নেই।
৯। ছড়ার মধ্যে চিরত্ব আছে। পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে ছড়া আছে ; এই সর্বজনীনতায় ও সর্বকালীনতার গুণে ছড়া পুরাতন হয়েও চির নতুন। [৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার মধ্যে চিত্ররূপময়তার স্বরূপ দেখতে পেয়েছেন। তাদের মতে ছড়ার মধ্যে পারস্পরিক অসংগতির অভাব দেখা গেলেও সার্বিকভাবে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তাই শিশুকে আকৃষ্ট করে। এই চিত্রকথার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ টুকরো গ্রামীণ ছবি তথা গ্রামীণ জীবনকেও ধরলেন, আবার ব্রতকথার ছড়ার মধ্যে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ও নাট্যধর্মিতা আবিষ্কার করলেন। ফলে অতীত জীবন অনুসন্ধানে ছড়ার গুরুত্ব অনেকখানিই বেড়ে গেল। ছড়া আকৃতিতে ছোট প্রকৃতি চিত্তে খেয়ালি ভাবনা বলে মনে হলেও লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি জনপ্রিয় শাখায় পরিণত হয়েছে। ওয়াকিল আহমেদ তাই বলেন - "শঙ্খের ভেতর যেমন সমুদ্রের কল্লোল ধ্বনি শোনা যায়, ছড়ায় তেমনি জাতির হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়, আর উত্তাপ অনুভব করা যায়।" [৬]

আপাতভাবে ছড়া রচনা খুব অনায়াস ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যা সহজ, তাই রচনা করা সব চাইতে কঠিন কাজ। ছড়া রচনা করতে গেলে সচেতন প্রয়াস আপনা আপনি যুক্ত হলে তাকে ছড়ার মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়। অন্যদিকে ছড়ায় অনেক প্রাচীন ইতিহাস লুকিয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু ছড়ার মূল্য সে কারণে নয়, ছড়ার গুরুত্ব বর্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ যাদের জন্য ছড়া লেখা হয়, সেই শিশুদের কাছে অতীতের কোন মূল্য নেই, তাদের আকর্ষণ কেবল বর্তমানে।

চিরত্ব ছড়াগুলির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত সচেতন প্রয়াসে সৃষ্ট সাহিত্য যখন অনায়াস বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়, সেক্ষেত্রে অসচেতনভাবে সৃষ্ট ছড়াগুলি চিরন্তনত্বের অধিকারী - এটা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। শিশু যেমন চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়তা শিশু চরিত্রের যেমন এক অপরিহার্য অঙ্গ, ছড়াগুলিও তেমনি অপরিবর্তিত থেকে গেছে একইভাবে আজ পর্যন্ত; কেবল অঞ্চলভিত্তিক পরিবর্তন ছাড়া। তাই বলা যায়, শিশু চরিত্রের সাথে ছড়া চরিত্রের একটি ঘনিষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে।

ছড়াগুলিকে অযত্নরচিত চিত্রের বিস্তৃত সাম্রাজ্যও বলা চলে। চিত্রগুলি যে শুধু অপরিণত ও বৈষয়িক বুদ্ধিমুক্ত শিশুদের কাছেই জীবন্ত রূপ পেয়েছে তাই নয়, বয়স্ক এবং বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেও চিত্রগুলির আবেদন অনেকখানি।

ছড়ার জগতে না আছে ভাবের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস, না সচেতন সৃষ্ট সাহিত্যের মত কার্যকারণজনিত যোগরক্ষার প্রয়াস। সচেতন সৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবের অসামঞ্জস্যতা মস্ত এক ত্রুটি,

কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতাই তার আকর্ষণের কারণ। বালকচিত্তে যেমন একটির পর একটি অসংলগ্ন ভাবের উদয় ঘটে, ছড়ার ক্ষেত্রেও সেই অসংলগ্নতা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির। যেমন -

' মাসি কাঁদে, পিসি কাঁদে চালে আছে ঝিঙ্গো,
পুঁটি মাছটা গীত গায় নেউলে বাজায় শিঙ্গো।
এক সে রাখাল গরু চরায় গামছা মাথায় দিয়ে
তার মাকে নিয়ে গেল বুড়া বাঁদরে।

ছড়া আকর্ষণের অন্য কারণটি হল স্নেহমিশ্রিত মধুর কণ্ঠের সুর সহযোগে বিশেষ উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় উপযুক্ত কণ্ঠ এবং আবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

অঞ্চলভেদে ছড়ার মধ্যে আমরা যে পাঠান্তর দেখি, সেই পাঠান্তরের সংখ্যা প্রাচুর্যের কারণ হল - একটি অখন্ড ভাব অথবা ভাবনার পরিবর্তে অসংলগ্ন নানা ভাব ও চিত্র ছড়ার উপজীব্য বিষয় হওয়ায় পরস্পর সম্পর্কহীন ভাবনা ও চিত্র প্রকাশে অনেকের অংশগ্রহণের অবকাশ থাকে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে কেবলমাত্র ছন্দ নির্মাণ কৌশলকে অবলম্বন করে স্থান ও পরিবেশ উপযোগী একই ছড়ার নানা রূপান্তর ঘটেছে নানা জনের হাতে। এই পাঠান্তর অথবা রূপান্তর কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, কেবলমাত্র ছন্দ নির্মিত কৌশলকে অবলম্বন করেই স্থান ও পরিবেশ উপযোগী একই ছড়ার নানা রূপান্তর ঘটেছে নানা জনের হাতে। সেই কারণে মূল ছড়া এবং পাঠান্তরিত ছড়ার মধ্যে বিভাজন করা দুরূহ ব্যাপার, আর তাই লোকসাহিত্যবিদরা পাঠান্তরিত সবকটি ছড়াকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষেত্রে বলেন - "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, দেখিয়া মনে হয় নিতান্ত নিরর্থক। ছড়ার কলা-বিচার, শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড় জগতে পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণ দান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হয়ে উঠেছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে অথচ শিশু মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।" (ছেলে ভুলানো ছড়া -১)

ছড়া রচনার উদ্ভব ও বিকাশ ঃ

ছড়ার রচনাকাল বলে কোন সময় বা যুগকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও ছড়াগুলিই যে সাহিত্যের অঙ্গানে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল একথা অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে - 'বাংলার লোকসাহিত্যে ছড়ারই যে প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। আধুনিককালে সংগৃহীত ছড়াগুলির ক্রম পরিবর্তিত রূপের মধ্যে ইহাদের উদ্ভবের কাল যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, বাংলা ইতিহাসের প্রথম প্রান্তে যে ডাক ও খনার নামে প্রচলিত ছড়াগুলি অবস্থিত, সে বিষয়ে কেহই সংশয় প্রকাশ করেন না।" [৭]

ছড়াগুলির উৎস অনুসন্ধানে আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে বাঙলার একান্ত নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব-ব্রত-পার্বণগুলির জন্য লিখিত ছড়াগুলির দিকে যা অধিকাংশই নারীজাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও লিখিত। "বাঙালীর ব্রত উৎসবের মধ্যে প্রাচীন সমাজের ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রাচীনকালের আদিম মানুষেরা মনের অতল তলে সঞ্চিত কামনাকে সফল করার পথে নকল নাচ-গানের আশ্রয় গ্রহণ করত।

এইসব করার পেছনে তাদের এই ধারণা কাজ করত যে, তাদের অন্তঃস্থিত কামনা হয়ত বা সফল হবে। এটাকে যাদুবিশ্বাস বলা যেতে পারে। অর্থাৎ কল্পনার হাতিয়ার দিয়ে অজেয় প্রকৃতিকে বশীভূত করার এক অদম্য প্রচেষ্টা। একদিকে বাস্তবের কঠোর কঠিন জীবনের অমীমাংসিত সমস্যা, অন্যদিকে কাল্পনিক রণসজ্জায় সমস্যার পরাজয়। এই কাল্পনিক জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা উৎসবে মেতে উঠত। বিশ্বাস করত অজেয় প্রকৃতি পরাভূত হয়েছে তাদের উদ্ভুত আচরণের জন্য। বাংলার প্রাচীন মেয়েলি ব্রত উৎসবের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণার পরিচয় আমরা পাই।" [৮]

ব্রতের ছড়াগুলির বীজ আবার নিহিত ছিল ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য 'বেদের' মধ্যেই। বেদের কবিরাও মুখে মুখে শ্লোক বা কবিতা রচনা করতেন যাকে আদিমতম ছড়া বলা যায়। প্রাচীনতম "ঋক বেদের" (০১/৩৮/১৪) সূক্তে বলা হয়েছে 'মিমীহি শ্লোক রচনা কর আর মেঘের মত তাকে বিস্তারিত কর।' সুতরাং এক অর্থে "বেদ লোকসাহিত্য এবং যেহেতু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয় তাই লোকজীবনের প্রতিবিম্ব 'বেদে' পড়েছে, 'বেদের' ঋষিরা শিশু রুচি ছিলেন। সুতরাং শিশু মনোরঞ্জক ছড়ার 'অপরিসীম গুরুত্বকে অস্বীকার তাঁরা করতে পারেন নি, বেদের নানা সূক্তে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।" [৯]

ন ভূমিং বাতো অতি বাতি নাতি পশ্যতি কশ্চন ।
স্থা স্ত্রিয়শ্চ সর্বাঃ স্বাপয় শুনশ্চেন্দ্র সখা চরণ্ ।। ১ অথর্ববেদ।।

(বায়ু যেন ভূমিকে অতিক্রম না করে অর্থাৎ অত্যন্ত বায়ু প্রভাবে যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়। হে বায়ু সকল স্ত্রী ও কুকুরদের ঘুম পাড়িয়ে দাও।)

অথর্ববেদের এই সূক্তগুলিতে বায়ুদেবতা এবং ঘুমপাড়ানি দেবতার মন্ত্র। সুকুমার সেন বলেছেন - "এই ধরনের ছড়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সর্বদেশের, সর্বকালের আদিম কবিতার বীজ, বাণীর প্রথম অঙ্কুর" (লোক সাহিত্য)। ছড়ার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে আদিম জননীর মতোই তা প্রাচীন, আদিম জননীর সুর ও বাণী সহযোগে যে মৌখিক শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল সেই ছন্দ সঙ্গীতের মধ্যেই উপ্ত হয়েছিল কবিতার প্রধান বীজ। এখান থেকেই প্রাণরস নিয়ে লেখা হয় অসংখ্য ঘুমপাড়ানি ছড়া। যেমন -

আয় ঘুম ভাসিয়া
চোখে বস হাসিয়া
কপালে বসে কর খেলা।
ঘুমায় খোকা দুপুরবেলা।

বাংলার একান্ত নিজস্ব উৎসব ব্রত পালনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ব্রতের ছড়া। এই ছড়াগুলি রচনার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক মেলবন্ধন। পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান। ব্রতের এই ছড়াগুলি রচিত হতো সেইসব বিষয়কে সামনে রেখে যা সমাজের পক্ষে, সংসারের পক্ষে হিতকর। এই ছড়াগুলির নায়ক-নায়িকা তারাই যারা একদিন সমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ শাসন করেছে এই ব্রতের ছড়াগুলি। যেমন -

ইতু ইতু ব্রাহ্মণ।
তুমি ইতু নারায়ণ ।।
তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিমকালে দিও থল।
সুষমী কলমী ঢল ঢল করে।
রাজার বেটা বচ্ছি গাড়ে।
গাড্ডুক বচ্ছি উড্ডুক চিল।
সোনার কৌঠা রূপার খিল।

এরপর ধীরে ধীরে সমাজের পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৭৫৭ খৃঃ বাঙালী ইংরেজ শাসনের আয়ত্বাধীনে আসে। এক মোহবন্ধন থেকে আর এক মোহজালে আটকে থাকার প্রাথমিক সময়সীমা ছিল একশত বছর। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙ্গালী জাতি প্রথম অনুভব করল পরাধীনতার লাঞ্ছনার গ্লানি। ইতিহাস বিস্মৃত জাতি সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে নিজেকে অনুসন্ধান করতে শিখল। এই অনুসন্ধানের সোপান বেয়েই রচিত হতে লাগল অসংখ্য লোকছড়া। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। তাঁর শক্তি, সাহস ও সৌন্দর্যের কাহিনী তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত । তাঁর বীরত্বের কাহিনি অবগুণ্ঠন অবরোধের অন্তরালে থাকা বাঙলার রমণীদের কাছে স্বপ্নসমান কল্পনা বলে মনে হলেও তারা উদ্দীপ্ত হতেন। এরপর বাঙলার উপর দিয়ে বারো ভুঁইঞ্যার যুগ, বর্গীর হাঙ্গামা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মন্বন্তর ইত্যাদি একের পর এক ঝোড়ো বাতাসের ধাক্কায় চিত্রিত হতে লাগলেন সেইসব রমণীরা যাঁরা ব্যতিক্রমী; কেউ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, কেউ প্রতিবাদে, যুদ্ধবিদ্যায় অথবা পতিপ্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। এইসব গৌরবগাথার কাহিনী মুখে মুখে রচিত হতে লাগল । মুখে মুখেই বিচরণ করতে লাগল দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত।

এইভাবেই বহির্জগতের প্রেক্ষাপটে অথবা নেহাতই ঘরোয়াভাবে একসময় হয়ত রচিত হয়েছে ছড়াগুলি, কিন্তু ছড়ার চলনশক্তি অসাধারণ। বাংলার এমন একটি ঘর নেই যেখানে কোন না কোন ছড়ার প্রচলন নেই। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ছড়ার নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই রচিত হয়ে ওঠে ছড়া। ভাব, ভাষা, ছন্দ, রস, রুচি, রূপ, শৈলীর মিলেই ছড়ার নিজস্ব ভুবন। ছড়া আবৃত্তি করা হয় এক বিশেষ পদ্ধতি বা সুরের আবহে। মৌখিক ভাষায় যাকে বলা হয় ছড়া-কাটা। চলতি রীতির ছোট ছোট বাক্য দ্বারা ছড়ার চরণ গঠিত হয়। ভাষা এখানে প্রধানত চিত্রধর্মী, তবে বর্ণনাধর্মী ও প্রতীকধর্মী ভাষাও ছড়ায় ব্যবহৃত হয়। ছড়ায় মূল রস বাৎসল্য, তবে করুণ, এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক ছড়াও আছে। প্রধানত ছড়ার ভাব হয় শোভন রুচিসম্পন্ন ও সর্বজনগ্রাহ্য। লৌকিক ছড়াগুলি বেশীরভাগই নৈর্ব্যক্তিক বলে আঘাতের তীব্রতা এতে প্রকাশ পায় না। এককথায় ছড়াগুলি এইভাবে যতই তার রচনার বিষয় ও পরিধি বাড়িয়ে নিয়েছে ততই ছড়াগুলির মধ্যে জাতির হৃদয়ের স্পন্দন আর উত্তাপ অনুভূত হয়েছে।

ছড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ

এই উপমহাদেশে ছড়ার ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো। অনেকেই ডাক খনার রচনাকে ছড়ার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করেন, কিন্তু এগুলি মূলত উপদেশাত্মক ও ভবিষ্যৎ গণনার জন্যই চিহ্নিত হয়েছে। ছড়া প্রকৃত অর্থে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে উনিশ শতক থেকেই। আঠার শতকে মোজাম্মেল হক রচিত 'পদ্যশিক্ষা' গ্রন্থটিকে কেউ কেউ ছড়ার প্রথম সংকলন বলে মনে করেন। উনিশ শতকের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আধুনিক ছড়ার রূপকার বলা হয়। সুকুমার রায় ছড়াকে সাহিত্য হিসবেই কেবল নয়, আধুনিক সাহিত্যের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবেই মর্যাদা দান করেছেন। বাংলা লোকছড়াগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ভূমিকা যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইউরোপীয় মিশনারী উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম মর্টন, রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ, স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, হানা ক্যাথেরীন মূলেন্স এবং রেভারেন্ড লালবিহারী দে। যদিও তাঁরা ছড়া বলে যেগুলো সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অধিকাংশই ছিল প্রবাদ। এই বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন - "ছড়া এবং প্রবাদে সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ ইংরেজ সংগ্রাহকদিগের থাকিবার কথা ছিল না, স্বতন্ত্রভাবে ছড়া বলিয়া কোন সংগ্রহ সেদিন পর্যন্ত নির্দেশ করা হয় নাই, সকলই প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।" [১০] তবুও ছড়া-সংগ্রাহক হিসাবে ইংরেজ মিশনারীদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে সেই উইলিয়াম কেরীর নামে প্রচলিত দুটি বই। 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'-র মধ্যে কিছু ছড়ার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন

233312 18 OCT 2011

LIBRARY NBU, DARJEELING

১। মুই লাচার কি করিমু।
মহাশয় তুই মা বাপ
তোমার চরণ ছাড়িমু না... (কথোপকথন)

২। মাছ আনিলা ছয় গন্ডা,
চিলে নিলে দুই গন্ডা
বাকি রইল ষোল।
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল,
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট,
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়,
তবে থাকিল দুই,
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই,
তবে থাকিল এক ;
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ।
এখন হইস্ যদি মানুষের পো,
কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো।
আমি যেই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে। [১১]

উইলিয়াম কেরীর পর ছড়া সংগ্রাহক হিসাবে যে মিশনারীর নাম করা যায় তিনি উইলিয়াম মর্টন। তিনি তাঁর 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' এবং পত্রিকায় কিছু ছড়া প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে সব কটিকে সঠিক অর্থে ছড়া বলা না গেলেও ছড়ার ধর্ম খানিকটা বজায় রয়েছে। এইরকমই দুটি ছড়া হল -

বৃষল জিজ্ঞাসে পন্ডিত কাছে।
মাকড় মারিলে কি দোষ আছে।।
পন্ডিত কহেন শুনহে ভাই।
সে পাপের তুলনা পাপেতে নাই।।
বৃষল কহিছে হইল আকড়।
তোমারি বালক বধেন মাকড়।।
শুনিয়া ক্রোধ যায় পন্ডিত কয়।
মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।

অন্য একটি ছড়া -

মন না মুড়ালে মুড়ালে কেশ।
গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।।
(৫১৯ নং ছড়া)

রেভারেন্ড জেম্‌স লং যিনি বাঙালির কাছে স্মরণীয় একটি নাম তিনিও সংগ্রহ করেছিলেন কিছু ছড়া। ১৮৫১ খৃঃ নামে ২১ পৃষ্ঠার যে পুস্তিকাটি তিনি প্রকাশ করেন তার মধ্যে ১৮৬টি প্রবাদ আছে। এই প্রবাদের অনেকগুলিকেই ছড়া নামে অভিহিত করা যায়।

ভাতার মারি জল কুমারী জলার ধারে ঘর।
আপনার ভাতার মেরেছি আমি
কোন শালাকে ডর ।।
মারি নাই ধরি নাই ধর‍্যে ছিল জটে।
একটি কিল মেরেছিলাম সেই সত্য বটে।।

অন্য একটি -

চাউল দেবে যত তত
চাউল দেবে তার তিন তত।
উথলিলে দিবে কাটী,
জাল দিবে উজান ভাটী,
তুলে দেখবে ফাটা তাত,
ফেন ঝরিবে পাত পাত।
তাতে যদি থাকে চাল,
গিন্নির কথা আল খাল।।

১৮৭৩ খৃঃ খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন উত্তরবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করেন মানিকচন্দ্র রাজার গান। যেটি ইংরেজী গীতিকা শ্রেণীর রচনা হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা অনেক অংশেই বাংলা ছড়ার স্বধর্মী। যেমন -

দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী,
সবার অধিক মিঠা মাও বড় জননী।।

এরপর ছড়ার সংগ্রাহক ও সংরক্ষক হিসাবে যাঁর নাম করতে হয়, তিনি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লোকসাহিত্য নামক গ্রন্থটির দুটি প্রবন্ধই ছড়া নিয়ে, যেমন ছেলে ভুলানো ছড়া - ১, ছেলে ভুলানো ছড়া - ২। তিনি গ্রামবাংলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করে একত্রিত করেছিলেন। "ছড়ার অবিকৃত রূপের উপর জোর দিয়ে, একই ছড়ার বিভিন্ন রূপান্তরকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়ে এবং সর্বোপরি লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা লোক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর অধ্যায় যুক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছড়ার মধ্যেকার গোপন গভীর বিশ্বের সন্ধান দিয়ে তিনি কেবল আমাদের জন্য নয়, আগামীকালের জন্যও একটি জ্যোতির্ময় দলিল রেখে গিয়েছেন। [১২]

রবীন্দ্র সংগৃহীত একটি ছড়া হল -

খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে।।
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হল খ্যা প্ত।।
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে।।

লৌকিক ছড়ার নিজস্ব জগতটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেন - 'টুকরো জগত'। তাঁর বক্তব্য - অনেক প্রাচীন ইতিহাস আর প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সব ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। কবির এই ধারণায় স্বপক্ষে 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল' ছড়াটির মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামার স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়ে আছে। কবি এই সূত্রেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, যেমন-তেমন করে লিখলেই ছড়া লেখা যায় না, কারণ ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি। গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ

লৌকিক জীবনযাত্রার ইতিকথা এইসব ছড়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই বাংলার লোকালয় বা জীবনের স্বরূপ জানতে গেলে তার উপাদান হিসাবে ছড়াগুলি আবশ্যিক হয়ে ওঠে। তাঁর সংগৃহীত ছড়ার একটি হল -

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি যেয়ো,
খাট নেই পালং নেই, খোকার চোখে বোসো।।
খোকার মা বাড়ি নেই শুয়ে ঘুম যেয়ো।
মাচার নীচে দুধ আছে, টেনে টুনে খেয়ো।।

ছড়া সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য অবদানকে স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, ছড়া চর্চা এবং সংগ্রহে বহু বাঙালির ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে আলোচক হিসাবে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। সংকলক হিসাবে নাম করা যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য (১৩৫৪), কমল কুমার মজুমদার (১৩৭০), ভবতারণ দত্ত (১৩৮০)। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ছড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাহকরা হলেন - আশুতোষ ভট্টাচার্য, সিরাজদ্দিন কাশিমপুরী, আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, ওয়াকিল আহমেদ, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু ভৌমিক, ভবতারণ দত্ত, সৈয়দ মোহাম্মেদ শাহেদ, কুঞ্জলাল রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আব্দুল করিম (সাহিত্য বিশারদ) ইত্যাদি। এদের সংগৃহীত ছড়া ও ছড়া বিষয়ক অন্তর্নিহিত চিন্তা ও চেতনার ফলে লোকসাহিত্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ছড়া আজ এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এর বিখ্যাত 'খুকুমণির চিন্তা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭-১৯৩৭ সালে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর 'ছেলেভুলানো ছড়া' থেকে বাংলার ছড়া সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় একাধিক নাম পাওয়া যায় মহিলাদের। যেমন - শতদলবাসিনী বিশ্বাস জায়া, রেণুকাবালা দাসী, নিরূপমা দেবী ইত্যাদি। এরপর ছড়া সংগ্রাহক ও আলোচক হিসাবে যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি ব্রজসুন্দর সান্যাল।

ছড়াগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন - "ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভান্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে... আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

গ্রন্থপঞ্জি

১। বসু রাজশেখর, আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, পৃঃ ২৪০

২। মিত্র সুবলচন্দ্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৫৫১

৩। ভৌমিক নির্মলেন্দু, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃঃ ১৩

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ পৃঃ ৮৯৮

৫। আহমেদ ওয়াকিল, বাংলার লোকসাহিত্য ছড়া, পৃঃ ২

৬। আহমেদ ওয়াকিল, বাংলার লোকসাহিত্য ছড়া, পৃঃ ৩

৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৪৮

৮। মুখোপাধ্যায় সুনীতকুমার, মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোক সাহিত্য, পৃঃ ১৬-১৭

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় শিখা, ছড়া চর্চায় সুকুমার সেন বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পাদনা : সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮০

১০। আহমেদ ওয়াকিল, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, ভূমিকাংশ, পৃঃ ৬

১১। ১৫০ সংখ্যক সংগ্রহ, ইতিহাসমালা

১২। ইসলাম মযহারুল, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃঃ ৫৩১